ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কেন্দ্র

৩৩টির মধ্যে ২১টির কোনো কাজ নেই

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০টিরও বেশি গবেষণা কেন্দ্রে নানামুখী সমস্যা বিরাজমান। এ বাবদ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গত অর্থবছরে ১ কোটি ১৯ লাখ ৭০ হাজার টাকা ব্যয় করে এবং ২০০৫-৬ অর্থ বছরে তা বৃদ্ধি করে ১ কোটি ৪৯ লাখে উন্নীত করা হয়। অথচ গবেষণার সংখ্যা হাতে গোনা।

অনেক গবেষণা কেন্দ্রের রেজিস্টার খাতায় গবেষণা শুরুর তারিখ, বিষয় এবং গবেষণার নাম পদবি পাওয়া গেলেও তা কবে শেষ হয়েছে কিংবা আদৌ শেষ হয়েছে কিনা তার কোনো রেকর্ড নেই। উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রে গত বছর মোট ১২টি গবেষণা কর্ম শুরু হলেও একটিও শেষ হয়নি। গবেষকবৃন্দ সবাই সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক। খোঁজ খবর করে জানা যায় অধিকাংশ গবেষকই তাদের গবেষণা শুরু করেননি কিন্তু তারা সবাই গবেষণার জন্য প্রাথমিকভাবে বাজেট করা অর্থ তুলে নিয়েছেন। এ গবেষণা কেন্দ্র গত বছর মোট ২৯টি সেমিনার আয়োজন করে এবং 'প্রবন্ধপঞ্জী' নামক একটি বার্ষিক প্রকাশনা বের করে। ড. সিরাজুল হক ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র ও গোবিন্দ চন্দ্র দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্রে একাধিকবার গেলেও কখনই খোলা পাওয়া যায়নি। সব সময়ই তালা ঝুলে।

নজরুল গবেষণা কেন্দ্রটি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বাইরে অবস্থিত। ধানমন্ডিতে এর অফিসে যোগাযোগ করা হলে তারা জানান, 'গত ২ বছর ধরে ২৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়। এতে কি কোনো গবেষণা হয়? তারপরেও বিভিন্ন সংস্থা থেকে অর্থ সংগ্রহ করে আমরা গবেষণা কেন্দ্রটি সচল রেখেছি।'

জাপান স্টাডি সেন্টারে জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স, লিডারশিপ বিল্ডিং কোর্স ছাড়াও জাপান স্টাডিজ নামক পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স করানো হয়। পরিচালক ড. আতাউর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুদানে কিছুই হয় না। বিভিন্ন সংস্থা অনুদান দেয় বলেই সেন্টারটি চলছে।

আবার দোয়েল চত্বরের পাশে এনার্জি পার্ক স্থাপন করা হয়েছিল বছর চারেক আগে। এখানে প্রতি বছর ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। গত ২ বছর যাবৎ পার্কটি বিকল হয়ে আছে। মেরামতেরও কোনো উদ্যোগ নেই এবং বরাদ্দকৃত অর্থ কোন খাতে ব্যবহৃত হয় তারও কোনো হিসাব নেই।

গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে বাজেটে প্রতিবছর ৩ লাখ টাকা বরাদ্দ থাকলেও এনার্জি পার্ক কেন পুনরায় চালু হচ্ছে না সেই প্রশ্নের উত্তর কারো জানা নেই।

বসু গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক বদরুল আলম সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান তার কেন্দ্রের নিজস্ব কোনো কক্ষ নেই। সায়েন্স ওয়ার্কশপের একটি কক্ষে অন্য একটি কেন্দ্রের সঙ্গে এক সঙ্গে কাজ করতে হয়। রিসার্চ কেন শেষ করা হয় না? প্রশ্ন করলে তিনি জানান, দেখুন গবেষণা একটি ক্রিয়েটিভ কাজ। জোর করে হয় না। ধীরে ধীরে করতে হয়। আবার অনেকে গবেষণা শেষে সেটি বিদেশী জার্নালে প্রকাশ করে আমাদের জানান না। এক ধরনের প্রতিযোগিতার কারণেই এই গোপনীয়তা থেকে যায়।

অধ্যাপক বদরুল আলম আরও জানান গবেষককে প্রতিমাসে একজন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার বেতন স্কেল অনুযায়ী সম্মানী প্রদান করা হত অর্থাৎ ৪৩০০ টাকা। বর্তমানে বেতন স্কেল বৃদ্ধি করা হলেও কেন্দ্রের অনুদান বৃদ্ধি করা হয়নি। এতে গবেষকদের সম্মানী প্রদানে বিরাট সমস্যা হবে বলে তিনি জানান।

দুর্যোগ গবেষণা প্রশিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র প্রতিবছর উপকূলীয় এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের দুর্যোগকালীন সময়ে করণীয় শীর্ষক কর্মশালা করে। সাধারণত জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসের দিকে এ কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

দেশে মাঝে মাঝে ছোটখাটো ভূমিকম্প হচ্ছে এবং বড় ধরনের ভূমিকম্পের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও ভূমিকম্প প্রকল্প নামে যে কেন্দ্রে প্রতি বছর ১ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয় তারা কোনো কাজ করেন না। এমনকি কোনো সেমিনার সিম্পোজিয়ামও না।

ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় বিজ্ঞান বিষয়ের অধিকাংশ গবেষণা কেন্দ্রে যন্ত্রপাতি নেই। অধিকাংশই ২০/৩০ বছরের পুরনো এবং ব্যবহারের অযোগ্য। দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ কেন্দ্রের প্রতি উদাসীন। গবেষণার জন্যে অবকাঠামো সৃষ্টির জন্যে যে ৪০ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয় তা কোন খাতে খরচ হয় তা জানেন না স্বয়ং কেন্দ্র পরিচালকগণই।

আবার কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগের কেন্দ্রগুলো দু' একটি সেমিনার এবং প্রকাশনা বের করেই নিজেদের দায়িত্ব শেষ করেন। জিজ্ঞাসা করলে একটাই উত্তর, যে বরাদ্দ দেয়া হয় তাতে এর চেয়ে বেশি সম্ভব নয়।

বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ কিংবা সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড ইনস্টিটিউশনাল স্টাডিজ নামক নব প্রতিষ্ঠিত কিছু গবেষণা কেন্দ্রকে বিশ্ববিদ্যালয় কোনো অর্থায়ন করে না। বিভিন্ন NGO কিংবা দাতা সংস্থা থেকে টাকা এনে এদের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

এভাবে সঠিক পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা দিন দিন কমে যাচ্ছে।

– মাহমুদ রাজু